আশ্ শামস

৯১

নামকরণ

সূরার প্রথম শব্দ আশ শাম্সকে (الشَّمْسِ) এর নাম গণ্য করা হয়েছে।

নাযিলের সময়-কাল

বিষয়বস্তু ও বর্ণনাভংগী থেকে জানা যায়, এ সূরাটিও মক্কা মু'আযযমায় প্রথম যুগে নাযিল হয়। কিন্তু এটি এমন সময় নাযিল হয় যখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরোধিতা তুংগে উঠেছিল।

বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য

এর বিষয়বস্তু হচ্ছে, সৎ ও অসৎ নেকী ও গোনাহর পার্থক্য বুঝানো এবং যারা এই পার্থক্য বুঝতে অস্বীকার করে আর গোনাহর পথে চলার ওপরই জোর দেয় তাদেরকে খারাপ পরিণতির ভয় দেখানো।

মূল বক্তব্যের দিক দিয়ে সূরাটি দু'ভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগটি শুরু হয়েছে সূরার সূচনা থেকে এবং ১০ আয়াতে গিয়ে শেষ হয়েছে। দ্বিতীয় ভাগটি ১১ আয়াত থেকে শুরু হয়ে সূরার শেষ পর্যন্ত চলেছে। প্রথম অংশে তিনটি কথা বুঝানো হয়েছে। এক, সূর্য ও চন্দ্র, দিন ও রাত, পৃথিবী ও আকাশ যেমন পরস্পর থেকে ভিন্ন এবং প্রভাব ও ফলাফলের দিক দিয়ে পরস্পর বিরোধী, ঠিক তেমনি সৎ ও অসৎ এবং নেকী ও গোনাহও পরস্পর ভিন্ন এবং প্রভাব ও ফলাফলের দিক দিয়েও তারা পরস্পর বিরোধী। এদের উভয়ের আকৃতি এক নয় এবং ফলাফলও এক হতে পারে না। দুই, মহান আল্লাহ মানবাত্মাকে দেহ, ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধি শক্তি দিয়ে দুনিয়ায় একেবারে চেতনাহীনভাবে ছেড়ে দেননি বরং একটি প্রাকৃতিক চেতনার মাধ্যমে তার অবচেতন মনে নেকী ও গোনাহর পার্থক্য, ভালো ও মন্দের প্রভেদ এবং ভালোর ভালো হওয়া ও মন্দের মন্দ হওয়ার বোধ সৃষ্টি করে দিয়েছেন। তিন, মানুষের মধ্যে পার্থক্য বোধ, সংকল্প ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের যে শক্তিসমূহ আল্লাহ রেখে দিয়েছেন, সেগুলো ব্যবহার করে সে নিজের প্রবৃত্তির ভালো ও মন্দ প্রবণতাগুলোর মধ্য থেকে কাউকে উদ্দীপিত করে আবার কাউকে দাবিয়ে দেয়। এরি ওপর তার ভবিষ্যত নির্ভর করে। যদি সে সৎপ্রবণতাগুলোকে উদ্দীপিত করে এবং অসৎ–প্রবণতাসমূহ থেকে নিজের নফ্সকে পবিত্র করে তাহলে সে সাফল্য লাভ করবে। বিপরীত পক্ষে যদি সে নফ্সের সৎপ্রবণতাকে দমিয়ে রাখার চেষ্টা করতে থাকে এবং অসৎ–প্রবণতাকে উদ্দীপিত করতে থাকে তাহলে সে ব্যর্থ হবে।

দ্বিতীয় অংশে সামূদ জাতির ঐতিহাসিক নজীর পেশ করে রিসালাতের গুরুত্ব বুঝানো হয়েছে। ভালো ও মন্দের যে চেতনালব্ধজ্ঞান আল্লাহ মানুষের প্রকৃতিতে রেখে দিয়েছেন তা মানুষের সঠিক পথের সন্ধান লাভ করার জন্য যথেষ্ট নয়। বরং তাকে পুরোপুরি না বুঝার কারণে মানুষ ভালো ও মন্দের বিভ্রান্তিকর দর্শন ও মানদণ্ড নির্ণয় করে পথভ্রষ্ট হতে থেকেছে। তাই মহান আল্লাহ এই প্রকৃতিগত চেতনাকে সাহায্য করার জন্য আম্বিয়া আলাইহিমুস সালামদের ওপর সুস্পষ্ট এ দ্ব্যর্থহীন অহী নাযিল করেছেন। এর ফলে তাঁরা সুস্পষ্টভাবে লোকদেরকে নেকী ও গোনাহ কি তা জানাতে পারবেন। এই উদ্দেশ্যেই আল্লাহ দুনিয়ায় নবী ও রসূল পাঠিয়েছেন। এই ধরনেরই একজন নবী ছিলেন হযরত সালেহ আলাইহিস সালাম। তাঁকে সামূদ জাতির কাছে পাঠানো হয়েছিল। কিন্তু সামূদরা তাদের প্রবৃত্তির অসৎপ্রবণতার মধ্যে ডুবে গিয়ে বড় বেশী হুকুম অমান্য করার ভূমিকা অবলম্বন করেছিল। যার ফলে তারা তাঁকে প্রত্যাখ্যান করলো। তাদের মু'জিযা দেখাবার দাবী অনুযায়ী তিনি তাদের সামনে একটি উটনী পেশ করলেন। তাঁর সাবধান বাণী সত্ত্বেও এই জাতীর সবচেয়ে দুশ্চরিত্র ব্যক্তিটি সমগ্র জাতির ইচ্ছা ও দাবী অনুযায়ী উটনীটিকে হত্যা করলো। এর ফলে শেষ পর্যন্ত সমগ্র জাতি ধ্বংস ও বরবাদ হয়ে গেলো।

সামূদ জাতির এ কাহিনী বর্ণনা করতে গিয়ে সমগ্র সূরার কোথাও একথা বলা হয়নি যে, হে কুরাইশ সম্প্রদায়! যদি তোমরা সামূদদের মতো তোমাদের নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে প্রত্যাখ্যান করো তাহলে তোমরাও সামূদের মতো একই পরিণামের সম্মুখীন হবে। সালেহ আলাইহিস সালামের মোকাবেলায় সামূদ জাতির দুশ্চরিত্র লোকেরা যে অবস্থা সৃষ্টি করে রেখেছিল মক্কায় সে সময় সেই একই অবস্থা বিরাজ করছিল। তাই এ অবস্থায় এই কাহিনী শুনিয়ে দেয়াটা আসলে সামূদদের এই ঐতিহাসিক নজীর কিভাবে মক্কাবাসীদের সাথে খাপ খেয়ে যাচ্ছে, তা বুঝিয়ে দেয়ার জন্য যথেষ্ট ছিল।

পরম করুণাময় মেহেরবান আল্লাহর নামে

وَالشَّمْسِ وَضُحٰهَا ۝١ وَالْقَمَرِ اِذَا تَلٰىهَا ۝٢ وَالنَّهَارِ اِذَا جَلّٰىهَا ۝٣ وَالَّيْلِ اِذَا يَغْشٰىهَا ۝٤ وَالسَّمَآءِ وَمَا بَنٰىهَا ۝٥ وَالْاَرْضِ وَمَا طَحٰىهَا ۝٦ وَنَفْسٍ وَّمَا سَوّٰىهَا ۝٧ فَاَلْهَمَهَا فُجُوْرَهَا وَتَقْوٰىهَا ۝٨ قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكّٰىهَا ۝٩ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسّٰىهَا ۝١٠

সূর্যের ও তার রোদের কসম।[১] চাঁদের কসম যখন তা সূর্যের পেছনে পেছনে আসে। দিনের কসম যখন তা (সূর্যকে) প্রকাশ করে। রাতের কসম যখন তা (সূর্যকে) ঢেকে নেয়।[২] আকাশের ও সেই সত্তার কসম যিনি তাকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন।[৩] পৃথিবীর ও সেই সত্তার কসম যিনি তাকে বিছিয়েছেন। মানুষের নফসের ও সেই সত্তার কসম যিনি তাকে ঠিকভাবে গঠন করেছেন।[৪] তারপর তার পাপ ও তার তাকওয়া তার প্রতি ইলহাম করেছেন।[৫] নিসন্দেহে সফল হয়ে গেছে সেই ব্যক্তির নফস্‌কে পরিশুদ্ধ করেছে এবং যে তাকে দাবিয়ে দিয়েছে সে ব্যর্থ হয়েছে।[৬]

১. মূলে দুহা (ضُحٰى) শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। দুহা মানে সূর্যের আলো ও তাপ দু'টোই। আরবী ভাষায় এর পরিচিত মানে হচ্ছে চাশ্‌তের সময়, যখন সূর্য উদয়ের পরে যথেষ্ট উপরে উঠে যায় কিন্তু উপরে ওঠার পরে কোন আলোই বেড়ে যায় না, তাপও বিকীরণ করতে থাকে। তাই 'দুহা' শব্দটি যখন সূর্যের সাথে সম্পর্কিত হয়, তখন তার আলো বা তার বদৌলতে যে দিনের উদয় হয় তা থেকে তার পুরোপুরি অর্থ প্রকাশ হয় না। বরং এর তুলনায় রোদ শব্দটি তার সঠিক ও পূর্ণ অর্থ প্রকাশ করে।

২. রাতের আগমনে সূর্য লুকিয়ে যায়। সারা রাত তার আলো দেখা যায় না। এই অবস্থাকে এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে ঃ রাত সূর্যকে ঢেকে নেয়। কারণ সূর্যের দিগন্ত রেখার নীচে নেমে যাওয়াকেই রাত বলে। এর ফলে পৃথিবীর যে অংশে রাত নামে সেখানে সূর্যের আলো পৌছতে পারে না।

৩. ছাদের মতো পৃথিবীর বুকে তাকে উঠিয়ে দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন। এই আয়াতে এবং এর পরের দু'টি আয়াতে 'মা' (مَا) শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। অর্থাৎ মা–বানাহা (مَابَنٰهَا) মা–তাহাহা (مَاطَحٰهَا) ও মা–সাওওয়াহা (مَاسَوّٰهَا)। মুফাস্‌সিরগণের একটি দল এই 'মা' শব্দটিকে ধাতুগত অর্থে ব্যবহার করেছেন। তারা এই আয়াতগুলোর অর্থ এভাবে বর্ণনা করেছেন ঃ আকাশ ও তাকে প্রতিষ্ঠিত করার কসম, পৃথিবী ও তাকে বিছিয়ে দেবার কসম এবং মানুষের নফ্‌সের ও তাকে ঠিকভাবে গঠন করার কসম। কিন্তু এ অর্থ ঠিক নয়। কারণ এই তিনটি বাক্যের পরে নিম্নোক্ত বাক্যটি আনা হয়েছে ঃ "তারপর তার পাপ ও তার তাকওয়া তার প্রতি ইলহাম করেছেন।" আর এই বাক্যটি আগের বাক্য তিনটির সাথে খাপ খায় না। অন্য মুফাস্‌সিরগণ এখানে 'মা' (مَا) কে মান (مَنْ) বা 'আল্‌লাযী' (الَّذِيْنَ) এর অর্থে ব্যবহার করেছেন। ফলে তারা এই বাক্যগুলোর অর্থ করেছেন ঃ যিনি আকাশকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন, যিনি পৃথিবীকে বিছিয়েছেন এবং যিনি মানুষের নফ্‌সকে ঠিকভাবে গঠন করেছেন। আমার মতে এই দ্বিতীয় অর্থটিই সঠিক। এর বিরুদ্ধে এ আপত্তি ওঠানো ঠিক হতে পারে না যে, আরবী ভাষায় 'মা' শব্দ প্রাণহীন বস্তু ও বুদ্ধিহীন জীবের জন্য ব্যবহার করা হয়। কারণ খোদ কুরআনেই 'মা' কে 'মান' অর্থে বহু জায়গায় ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন, وَلَا اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَا اَعْبُدُ (আর না তোমরা তার ইবাদাত করো যার ইবাদাত আমি করি)। فَانْكِحُوْا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَآءِ (কাজেই মেয়েদের মধ্য থেকে যাদেরকে তোমরা পসন্দ করো বিয়ে করে নাও)। وَلَا تَنْكِحُوْا مَا نَكَحَ اٰبَآؤُكُمْ مِّنَ النِّسَآءِ (আর যেসব মেয়েকে তোমাদের বাপেরা বিয়ে করেছে তাদেরকে বিয়ে করো না)।

৪. 'ঠিকভাবে গঠন করেছেন' মানে হচ্ছে, তাকে এমন একটি দেহ দান করেছেন, যা তার সুডৌল গঠনাকৃতি, হাত–পা ও মস্তিষ্ক সংযোজনের দিক থেকে মানবিক জীবন যাপন করার জন্য সবচেয়ে উপযোগী ছিল। তাকে দেখার, শুনার, স্পর্শ করার, স্বাদ গ্রহণ করার ও ঘ্রাণ নেবার জন্য এমন ইন্দ্রিয় দান করেছেন যা তার বৈশিষ্ট ও আনুপাতিক কর্মক্ষমতার দিক দিয়ে তার জন্য জ্ঞান অর্জনের সবচেয়ে ভালো উপায় হতে পারতো। তাকে চিন্তা ও বুদ্ধি–বিবেচনার শক্তি, যুক্তি উপস্থাপন ও প্রমাণ পেশ করার শক্তি, কল্পনা শক্তি, স্মৃতি শক্তি, পার্থক্য করার শক্তি, সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার শক্তি, সংকল্প শক্তি এবং এমন অনেক মানসিক শক্তি দান করেছেন যার ফলে সে এই দুনিয়ায় মানুষের মতো কাজ করার যোগ্যতা অর্জন করেছে। এছাড়া "ঠিকভাবে গঠন করার" মধ্যে এ অর্থও রয়েছে যে, তাকে জন্মগত পাপী ও প্রকৃতিগত বদমায়েশ হিসেবে তৈরি না করে বরং সহজ সরল প্রকৃতির ভিত্তিতে সৃষ্টি করেছেন। তার ঘঠনাকৃতিতে এমন ধরনের কোন বক্রতা রেখে দেননি যা তাকে সোজাপথ অবলম্বন করতে চাইলেও করতে দিতো না। একথাটিকেই সূরা রূমে নিম্নোক্তভাবে বর্ণনা করা হয়েছে ঃ فِطْرَتَ اللّٰهِ الَّتِىْ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا "সেই প্রকৃতির ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাও যার ওপর আল্লাহ মানুষকে সৃষ্টি করেছেন।" (২০ আয়াত) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালাম এ কথাটিকেই একটি হাদীসে এভাবে বর্ণনা করেছেন ঃ "এমন কোন শিশু নেই যে প্রকৃতি ছাড়া অন্যকিছুর ওপর পয়দা হয়। তারপর মা–বাপ তাকে ইহুদি, খৃস্টান বা অগ্নি উপাসক বানায়। এটা তেমনি যেমন পশুর পেট থেকে সুস্থ, সবল ও পূর্ণ অবয়ব বিশিষ্ট বাচ্চা পয়দা হয়। তোমরা কি তাদের কাউকে কানকাটা পেয়েছো? (বুখারী ও মুসলিম) অর্থাৎ পরবর্তী কালে মুশরিকরা তাদের জাহেলী

কুসংস্কারের কারণে পশুদের কান কেটে দেয়। নয়তো আল্লাহ কোন পশুকে তার মায়ের পেট থেকে কানকাটা অবস্থায় পয়দা করেননি। অন্য একটি হাদীসে নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ "আমর রব বলেন, আমার সকল বান্দাকে আমি হানীফ (সঠিক প্রকৃতির ওপর) সৃষ্টি করেছিলাম। তারপর শয়তানরা এসে তাদেরকে তাদের দীন (অর্থাৎ তাদের প্রাকৃতিক দীন) থেকে সরিয়ে দিয়েছে এবং তাদের ওপর এমন সব জিনিস হারাম করে দিয়েছে যা আমি তাদের জন্য হালাল করে দিয়েছিলাম। শয়তানরা আমার সাথে তাদেরকে শরীক করার জন্য তাদেরকে হুকুম দিয়েছে, অথচ আমার সাথে তাদের শরীক হবার ব্যাপারে আমি কোন প্রমাণ নাযিল করিনি।" (মুসনাদে আহমাদ, ইমাম মুসলিমও প্রায় একই রকম শব্দ সহকারে এ হাদীসটি উদ্ধৃত করেছেন)

৫. ইলহাম শব্দটির উৎপত্তি লহ্ম (لَهْم) থেকে। এর মানে গিলে ফেলা। যেমন বলা হয়, لَهِمَ الشَّيْءَ التَهَمَهُ উমুক ব্যক্তি জিনিসটিকে গিলে ফেলেছে। আর أَلْهَمْتُهُ الشَّيْءَ মানে হয়, আমি উমুক জিনিসটি তাকে গিলিয়ে দিয়েছি বা তার গলার নীচে নামিয়ে দিয়েছি। এই মৌলিক অর্থের দিক দিয়ে ইলহাম শব্দ পারিভাষিক অর্থে আল্লাহর পক্ষ থেকে কোন কল্পনা বা চিন্তাকে অবচেতনভাবে বান্দার মন ও মস্তিষ্কের গোপন প্রদেশে নামিয়ে দেয়ার জন্য ব্যবহৃত হয়। মানুষের প্রতি তার পাপ এবং তার নেকী ও তাকওয়া ইলহাম করে দেয়ার দু'টি অর্থ হয়। এক, স্রষ্টা তার মধ্যে নেকী ও গোনাহ উভয়ের ঝোঁক প্রবণতা রেখে দিয়েছেন। প্রত্যেক ব্যক্তিই এটি অনুভব করে। দুই, প্রত্যেক ব্যক্তির অবচেতন মনে আল্লাহ এ চিন্তাটি রেখে দিয়েছেন যে, নৈতিকতার ক্ষেত্রে কোন্ জিনিস ভালো ও কোন্ জিনিস মন্দ এবং সৎ নৈতিক বৃত্তি ও সৎকাজ এবং অসৎ নৈতিক বৃত্তি ও অসৎকাজ সমান নয়। ফুজুর (দুষ্কৃতি ও পাপ) একটি খারাপ জিনিস এবং তাকওয়া (খারাপ কাজ থেকে দূরে থাকা) একটি ভালো জিনিস, এ চিন্তাধারা মানুষের জন্য নতুন নয়। বরং তার প্রকৃতি এগুলোর সাথে পরিচিত। স্রষ্টা তার মধ্যে জন্মগতভাবে ভালো ও মন্দের পার্থক্যবোধ সৃষ্টি করে দিয়েছেন। একথাটিই সূরা আল বালাদে এভাবে বলা হয়েছে ঃ وَهَدَيْنَهُ النَّجْدَيْنِ "আর আমি ভালো ও মন্দ উভয় পথ তার জন্য সুস্পষ্ট করে রেখে দিয়েছি।" (১০ আয়াত) সূরা আদ্দাহ্রে নিম্নোক্তভাবে বর্ণনা করা হয়েছে ঃ اِنَّا هَدَيْنَهُ السَّبِيْلَ اِمَّا شَاكِرًا وَّاِمَّا كَفُوْرًا "আমি তাদেরকে পথ দেখিয়ে দিয়েছি, চাইলে তারা কৃতজ্ঞ হতে পারে আবার চাইলে হতে পারে অস্বীকারকারী।" (৩ আয়াত) একথাটিই সূরা আল কিয়ামাহে বর্ণনা করা হয়েছে এভাবেঃ মানুষের মধ্যে একটি নফ্সে লাওয়ামাহ (বিবেক) আছে। সে অসৎকাজ করলে তাকে তিরস্কার করে। (২ আয়াত) আর প্রত্যেক ব্যক্তি সে যতই ওজর পেশ করুক না কেন সে কি তা সে খুব ভালো করেই জানে। (১৪-১৫ আয়াত)

এখানে একথাটিও ভালোভাবে বুঝে নিতে হবে যে, মহান আল্লাহ স্বভাবজাত ও প্রকৃতিগত ইলহাম করেছেন প্রত্যেক সৃষ্টির প্রতি তার মর্যাদা, ভূমিকা ও স্বরূপ অনুযায়ী। যেমন সূরা ত্বা-হা'য় বলা হয়েছে ঃ اَلَّذِىْ اَعْطٰى كُلَّ شَىْءٍ خَلْقَهٗ ثُمَّ هَدٰى "যিনি প্রত্যেকটি জিনিসকে তার আকৃতি দান করেছেন, তারপর তাকে পথ দেখিয়েছেন।" (৫০ আয়াত) যেমন প্রাণীদের প্রত্যেক প্রজাতিকে তার প্রয়োজন অনুযায়ী ইলহামী জ্ঞান দান করা হয়েছে। যার ফলে মাছ নিজে নিজেই সাঁতার কাটে। পাখি উড়ে বেড়ায়। মৌমাছি

মৌচাক তৈরি করে। চাতক বাসা বানায়। মানুষকেও তার বিভিন্ন পর্যায় ও ভূমিকার ক্ষেত্রে পৃথক পৃথক ইলহামী জ্ঞান দান করা হয়েছে। মানুষ এক দিক দিয়ে প্রাণী গোষ্ঠীভুক্ত। এই দিক দিয়ে তাকে যে ইলহামী জ্ঞান দান করা হয়েছে তার একটি সুস্পষ্ট দৃষ্টান্ত হচ্ছে, মানব শিশু জন্মের সাথে সাথেই মায়ের স্তন চুষতে থাকে। আল্লাহ যদি প্রকৃতিগতভাবে তাকে এ শিক্ষাটি না দিতেন তাহলে তাকে এ কৌশলটি শিক্ষা দেবার সাধ্য কারো ছিল না। অন্যদিক দিয়ে মানুষ একটি বুদ্ধিবৃত্তিক প্রাণী। এদিক দিয়ে তার সৃষ্টির শুরু থেকেই আল্লাহ তাকে অনবরত ইলহামী পথনির্দেশনা দিয়ে চলছেন। এর ফলে সে একের পর এক উদ্ভাবন ও আবিষ্কারের মাধ্যমে মানব সভ্যতার বিকাশ সাধন করছে। এই সমস্ত উদ্ভাবন ও আবিষ্কারের ইতিহাস অধ্যয়নকারী যে কোন ব্যক্তিই একথা অনুভব করবেন যে, সম্ভবত মানুষের চিন্তা ও পরিশ্রমের ফল হিসেবে দু' একটি ব্যতিক্রম ছাড়া প্রত্যেকটি আবিষ্কার আকস্মিকভাবে শুরু হয়েছে। হঠাৎ এক ব্যক্তির মাথায় একটি চিন্তার উদয় হয়েছে এবং তারই ভিত্তিতে সে কোন জিনিস আবিষ্কার করেছে। এই দু'টি মর্যাদা ছাড়াও মানুষের আর একটি মর্যাদা ও ভূমিকা আছে। সে একটি নৈতিক জীবও। এই পর্যায়ে আল্লাহ তাকে ভালো ও মন্দের মধ্যে পার্থক্য করার শক্তি এবং ভালোকে ভালো ও মন্দকে মন্দ জানার অনুভূতি ইলহাম করেছেন। এই শক্তি, বোধ ও অনুভূতি একটি বিশ্বজনীন সত্য। এর ফলে আজ পর্যন্ত দুনিয়ায় এমন কোন সমাজ সভ্যতা গড়ে ওঠেনি যেখানে ভালো ও মন্দের ধারণা ও চিন্তা কার্যকর ছিল না। আর এমন কোন সমাজ ইতিহাসে কোন দিন পাওয়া যায়নি এবং আজো পাওয়া যায় না যেখানকার ব্যবস্থায় ভালো ও মন্দের এবং সৎ ও অসৎকর্মের জন্য পুরস্কার ও শাস্তির কোন না কোন পদ্ধতি অবলম্বিত হয়নি। প্রতিযুগে, প্রত্যেক জায়গায় এবং সভ্যতা–সংস্কৃতির প্রত্যেক পর্যায়ে এই জিনিসটির অস্তিত্বই এর স্বভাবজাত ও প্রকৃতিগত হবার সুস্পষ্ট প্রমাণ। এছাড়াও একজন বিজ্ঞ ও বিচক্ষণ স্রষ্টা মানুষের প্রকৃতির মধ্যেই এটি গচ্ছিত রেখেছেন, একথাও এ থেকে প্রমাণিত হয়। কারণ যেসব উপাদানে মানুষ তৈরি এবং যেসব আইন ও নিয়মের মাধ্যমে জড় জগত চলছে তার কোথাও নৈতিকতার কোন একটি বিষয়ও চিহ্নিত করা যাবে না।

৬. একথাটির ওপরই ওপরের আয়াতগুলোতে বিভিন্ন জিনিসের কসম খাওয়া হয়েছে। ওই জিনিসগুলো থেকে একথাটি কিভাবে প্রমাণ হয় তা এখন চিন্তা করে দেখুন। যেসব গভীর তত্ত্ব আল্লাহ মানুষকে বুঝাতে চান সেগুলো সম্পর্কে তিনি কুরআনে যে বিশেষ নিয়ম অবলম্বন করেছেন তা হচ্ছে এই যে, সেগুলো প্রমাণ করার জন্য তিনি হাতের কাছের এমন কিছু সুস্পষ্ট ও সর্বজন পরিচিত জিনিস পেশ করেন, যা প্রত্যেক ব্যক্তি তার আশেপাশে অথবা নিজের অস্তিত্বের মধ্যে প্রতিদিন ও প্রতি মুহূর্তে দেখে। এই নিয়ম অনুযায়ী এখানে এক এক জোড়া জিনিস নিয়ে তাদেরকে পরস্পরের বিরুদ্ধে পেশ করা হয়েছে। তারা পরস্পরের বিপরীতধর্মী কাজেই তাদের প্রভাব ও ফলাফলও সমান নয়। বরং অনিবার্যভাবে তারা পরস্পর বিভিন্ন। একদিকে সূর্য, অন্যদিকে চাঁদ। সূর্যের আলো অত্যন্ত প্রখর। এর মধ্যে রয়েছে তাপ। এর তুলনায় চাঁদের নিজের কোন আলো নেই। সূর্যের উপস্থিতিতে সে আকাশে থাকলেও আলোহীন থাকে। সূর্য ডুবে যাবার পর সে উজ্জ্বল হয়। সে সময়ও তার আলোর মধ্যে রাতকে দিন বানিয়ে দেবার ঔজ্জ্বল্য থাকে না। সূর্য তার আলোর প্রখরতা দিয়ে দুনিয়ায় যে কাজ করে চাঁদের আলোর মধ্যে সে প্রখরতা থাকে না। তবে তার নিজস্ব কিছু প্রভাব রয়েছে। এগুলো সূর্যের প্রভাব থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির।

এভাবে একদিকে আছে দিন এবং অন্যদিকে রাত। এরা পরস্পরের বিপরীতধর্মী। উভয়ের প্রভাব ও ফলাফল এত বেশী বিভিন্ন যে, এদেরকে কেউ একসাথে জমা করতে পারে না। এমন কি সবচেয়ে নিবোর্ধ ব্যক্তিটির পক্ষেও একথা বলা সম্ভব হয় না যে, রাত হলেই বা কি আর দিন হলেই বা কি, এতে কোন পার্থক্য হয় না। ঠিক তেমনি একদিকে রয়েছে আকাশ। স্রষ্টা তাকে উঁচুতে স্থাপন করেছেন। অন্যদিকে রয়েছে পৃথিবী। এর স্রষ্টা একে আকাশের তলায় বিছানার মতো করে বিছিয়ে দিয়েছেন। এরা উভয়েই একই বিশ্ব জাহানের ও তার ব্যবস্থার সেবা করছে এবং তার প্রয়োজন পূর্ণ করছে। কিন্তু উভয়ের কাজ এবং প্রভাব ও ফলাফলের মধ্যে আসমান-যমীন ফারাক। উর্ধজগতের এই সাক্ষ প্রমাণগুলো পেশ করার পর মানুষের নিজের শরীর সম্পর্কে বলা হয়েছে, তার অংগ-প্রত্যংগ এবং ইন্দ্রিয় ও মস্তিষ্কের শক্তিগুলোকে আনুপাতিক ও সমতাপূর্ণ মিশ্রণের মাধ্যমে সুগঠিত করে স্রষ্টা তার মধ্যে সৎ ও অসৎ উভয় প্রবনতা ও কার্যকারণসমূহ রেখে দিয়েছেন। এগুলো পরস্পরের বিপরীত ধর্মী। ইলহামী তথা অবচেতনভাবে তাকে এদের উভয়ের পার্থক্য বুঝিয়ে দিয়েছেন। তাকে জানিয়ে দিয়েছেন, এদের একটি হচ্ছে ফুজুর-দুষ্কৃতি, তা খারাপ এবং অন্যটি হচ্ছে, তাকওয়া-আল্লাহভীতি, তা ভালো। এখন যদি সূর্য ও চন্দ্র, রাত ও দিন এবং আকাশ ও পৃথিবী এক না হয়ে থাকে বরং তাদের প্রভাব ও ফলাফল অনিবার্যভাবে পরস্পর থেকে আলাদা হয়ে থাকে তাহলে, মানুষের নফ্সের দুস্কৃতি ও তাকওয়া পরস্পরের বিপরীতধর্মী হওয়া সত্ত্বেও এক হতে পারে কেমন করে? মানুষ নিজেই এই দুনিয়ায় নেকী ও পাপকে এই মনে করে না। নিজের মনগড়া দর্শনের দৃষ্টিতে সে যদি ভালো ও মন্দের কিছু মানদণ্ড তৈরি করে নিয়েই থাকে তাহলেও যে জিনিসটিকে সে নেকী মনে করে, সে সম্পর্কে তার অভিমত হচ্ছে এই যে, তা প্রশংসনীয় এবং প্রতিফল ও পুরস্কার লাভের যোগ্য। অন্যদিকে যাকে সে অসৎ ও গোনাহ মনে করে, সে সম্পর্কে তার নিজের নিরপেক্ষ অভিমত হচ্ছে এই যে, তা নিন্দনীয় ও শাস্তির যোগ্য। কিন্তু আসল ফায়সালা মানুষের হাতে নেই। বরং যে স্রষ্টা মানুষের প্রতি তার গোনাহ ও তাকওয়া ইলহাম করেছেন তার হাতেই রয়েছে এর ফায়সালা। স্রষ্টার দৃষ্টিতে যা গোনাহ ও দুষ্কৃতি আসলে তাই হচ্ছে গোনাহ ও দুষ্কৃতি এবং তাঁর দৃষ্টিতে যা তাকওয়া আসলে তাই হচ্ছে তাকওয়া। স্রষ্টার কাছে এ দু'টির রয়েছে পৃথক পরিণাম। একটির পরিণাম হচ্ছে, যে নিজের নফ্সের পরিশুদ্ধি করবে সে সাফল্য লাভ করবে এবং অন্যটির পরিণাম হচ্ছে, যে ব্যক্তি নিজের নফ্সকে দাবিয়ে দেবে সে ব্যর্থ হবে।

তাযাক্কা (تـزكـى) পরিশুদ্ধ করা মানে পাক-পবিত্র করা, বিকশিত করা এবং উদ্বুদ্ধ ও উন্নত করা। পূর্বাপর সম্পর্কের ভিত্তিতে এর পরিষ্কার অর্থ দাঁড়ায়, যে ব্যক্তি নিজের নফস্ ও প্রবৃত্তিকে দুষ্কৃতি থেকে পাক-পবিত্র করে, তাকে উদ্বুদ্ধ ও উন্নত করে তাকওয়ার উচ্চতম পর্যায়ে নিয়ে যায় এবং তার মধ্যে সৎপ্রবণতাকে বিকশিত করে, সে সাফল্য লাভ করবে। এর মোকাবেলায় দাস্সাহা (دَسَّـهَا) শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এর শব্দমূল হচ্ছে তাদ্সীয়া (تـدسـيـه) তাদ্সীয়া মানে হচ্ছে দাবিয়ে দেয়া, লুকিয়ে ফেলা, ছিনিয়ে নেয়া, আত্মসাৎ করা ও পথভ্রষ্ট করা। পূর্বাপর সম্পর্কের ভিত্তিতে এর অর্থও এখানে সুস্পষ্ট হয়ে যায় অর্থাৎ সেই ব্যক্তি ব্যর্থ হবে, যে নিজের নফ্সের মধ্যে নেকী ও সৎকর্মের যে প্রবণতা পাওয়া যাচ্ছিল তাকে উদ্দীপিত ও বিকশিত করার পরিবর্তে দাবিয়ে দেয়, তাকে

বিভ্রান্ত করে অসৎপ্রবণতার দিকে নিয়ে যায় এবং দুষ্কৃতিকে তার ওপর এত বেশী প্রবল করে দেয় যার ফলে তাকওয়া তার নীচে এমনভাবে মুখ ঢাকে যেমন কোন লাশকে কবরের মধ্যে রেখে তার ওপর মাটি চাপা দিলে তা ঢেকে যায়। কোন কোন তাফসীরকার এই আয়াতের অর্থ বর্ণনা করে বলেছেন قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكَّى اللّٰهُ نَفْسَهُ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّى اللّٰهُ نَفْسَهُ অর্থাৎ যে ব্যক্তির নফ্সকে আল্লাহ পাক-পবিত্র করে দিয়েছেন সে সাফল্য লাভ করেছে এবং যার নফ্সকে আল্লাহ দাবিয়ে দিয়েছেন সে ব্যর্থ হয়ে গেছে। কিন্তু এ ব্যাখ্যাটি প্রথমত ভাষার দিক দিয়ে কুরআনের বর্ণনাভংগীর পরিপন্থী। কারণ আল্লাহর যদি একথা বলাই উদ্দেশ্য হতো, তাহলে তিনি এভাবে বলতেন ঃ قَدْ اَفْلَحَتْ مَنْ زَكَّهَا اللّٰهُ وَقَدْ خَابَتْ مَنْ دَسَّهَا اللّٰهُ (যে নফ্সকে আল্লাহ পাক-পবিত্র করে দিয়েছেন সে সফল হয়ে গেছে এবং ব্যর্থ হয়ে গেছে সেই নফ্স যাকে আল্লাহ দাবিয়ে দিয়েছেন।) দ্বিতীয়, এই ব্যাখ্যাটি এই বিষয়বস্তু সম্বলিত কুরআনের অন্যান্য বর্ণনার সাথে সংঘর্ষশীল। সূরা আ'লায় মহান আল্লাহ বলেছেন ঃ قَدْ اَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى (সফল হয়ে গেছে সেই ব্যক্তি যে পবিত্রতা অবলম্বন করেছে—৪ আয়াত) সূরা 'আবাসায় মহান আল্লাহ রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করে বলেছেন ঃ وَمَا عَلَيْكَ اَلاَّ يَزَّكَّى "তোমাদের ওপর কি দায়িত্ব আছে যদি তারা পবিত্রতা অবলম্বন না করে?" এই দু'টি আয়াতে পবিত্রতা অবলম্বন করাকে বান্দার কাজ হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। এ ছাড়াও কুরআনের বিভিন্ন স্থানে এ সত্যটি বর্ণনা করা হয়েছে যে, এই দুনিয়ায় মানুষের পরীক্ষা গ্রহণ করা হচ্ছে। যেমন সূরা দাহ্র-এ বলা হয়েছে ঃ "আমি মানুষকে একটি মিশ্রিত শুক্র থেকে পয়দা করেছি, যাতে তাকে পরীক্ষা করতে পারি, তাই তাকে আমি শোনার ও দেখার ক্ষমতা দিয়েছি।" (২ আয়াত) সূরা মূল্কে বলা হয়েছে ঃ "তিনি মৃত্যু ও জীবন উদ্ভাবন করেছেন, যাতে তোমাদের পরীক্ষা করা যায় যে, তোমাদের মধ্যে কে ভালো কাজ করে।" (২ আয়াত) যখন একথা সুস্পষ্ট, পরীক্ষা গ্রহণকারী যদি আগেভাগেই একজন পরীক্ষার্থীকে সামনে বাড়িয়ে দেয় এবং অন্যজনকে দাবিয়ে দেয় তাহলে আদতে পরীক্ষাই অর্থহীন হয়ে পড়ে। কাজেই কাতাদাহ, ইকরামা, মুজাহিদ ও সাঈদ ইবনে জুবাইর যা বলেছেন সেটিই হচ্ছে এর আসল তাফ্সীর। তারা বলেছেন ঃ যাক্কাহা ও দাস্সাহা'র কর্তা হচ্ছে বান্দা, আল্লাহ নন। আর ইবনে আবী হাতেম জুওয়াইর ইবনে সাঈদ থেকে এবং তিনি যাহ্হাক থেকে এবং যাহ্হাক ইবনে আব্বাস (রা) থেকে একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন, যাতে রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেই এই আয়াতের অর্থ বর্ণনা করে বলেছেন ঃ اَفْلَحَتْ نَفْسٌ زَكَّهَا اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ (সফল হয়ে গেছে সেই ব্যক্তি যাকে মহান পরাক্রমশালী আল্লাহ পবিত্র করে দিয়েছেন)। এ হাদীসটি সম্পর্কে বলা যায়, এখানে রসূলুল্লাহ (সা)-এর যে উক্তি পেশ করা হয়েছে তা আসলে তাঁর থেকে প্রমাণিত নয়। কারণ এই সনদের রাবী জুওয়াইর একজন প্রত্যাখ্যাত রাবী। অন্যদিকে ইবনে আব্বাসের সাথে যাহ্হাকের সাক্ষাত হয়নি। তবে ইমাম আহমাদ, মুসলিম, নাসাঈ ও ইবনে আবী শাইবা হযরত যায়েদ ইবনে আরকাম (রা) থেকে যে রেওয়ায়াতটি করেছেন সেটি অবশ্যি একটি সহীহ হাদীস। তাতে বলা হয়েছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দোয়া করতেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اٰتِ نَفْسِى تَقْوَاهَا وَزَكِّهَا اَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا اَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلاَهَا

كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوٰىهَآ ﴿١١﴾ إِذِ انۢبَعَثَ أَشْقٰىهَا ﴿١٢﴾ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللّٰهِ نَاقَةَ اللّٰهِ وَسُقْيٰهَا ﴿١٣﴾ فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُم بِذَنۢبِهِمْ فَسَوّٰىهَا ﴿١٤﴾ وَلَا يَخَافُ عُقْبٰهَا ﴿١٥﴾

সামূদ জাতি[৭] নিজের বিদ্রোহের কারণে মিথ্যা আরোপ করলো।[৮] যখন সেই জাতির সবচেয়ে বড় হতভাগ্য লোকটি ক্ষেপে গলো, আল্লাহর রসূল তাদেরকে বললো ঃ সাবধান! আল্লাহর উটনীকে স্পর্শ করো না এবং তাকে পানি পান করতে (বাধা দিয়ো না)[৯] কিন্তু তারা তার কথা প্রত্যাখ্যান করলো এবং উটনীটিকে মেরে ফেললো।[১০] অবশেষে তাদের গোনাহের কারণে তাদের রব তাদের ওপর বিপদের পাহাড় চাপিয়ে দিয়ে তাদেরকে মাটির সাথে মিশিয়ে দিলেন। আর তিনি (তাঁর এই কাজের) খারাপ পরিণতির কোন ভয়ই করেন না।[১১]

"হে আল্লাহ! আমার নফ্সকে তার তাকওয়া দান করো এবং তাকে পবিত্র করো। তাকে পবিত্র করার জন্যে তুমিই সর্বোত্তম সত্তা। তুমিই তার অভিভাবক ও পৃষ্ঠপোষক।"

রসূলের প্রায় এই একই ধরনের দোয়া তাবারানী, ইবনে মারদুইয়া ও ইবনুল মুনযির হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস থেকে এবং ইমাম আহমাদ হযরত আয়েশা থেকে উদ্ধৃত করেছেন। মূলত এর অর্থ হচ্ছে, বান্দা কেবল তাকওয়া ও তাযকীয়া তথা পবিত্রতা অবলম্বন করার ইচ্ছাই প্রকাশ করতে পারে। তবে তা তার ভাগ্যে জুটে যাওয়া আল্লাহর ইচ্ছা ও তাওফীকের ওপর নির্ভর করে। তাদসীয়া তথা নফসকে দাবিয়ে দেবার ব্যাপারেও এই একই অবস্থা অর্থাৎ আল্লাহ জোর করে কোন নফ্সকে দাবিয়ে দেন না। কিন্তু বান্দা যখন এ ব্যাপারে একেবারে আদা–পানি খেয়ে লাগে তখন তাকে তাক্ওয়া ও তায্কীয়ার তাওফীক থেকে বঞ্চিত করেন এবং সে তার নফ্সকে যে ধরনের ময়লা আবর্জনার মধ্যে দাবিয়ে দিতে চায় তার মধ্যেই তাকে ছেড়ে দেন।

৭. ওপরের আয়াতগুলোতে নীতিগতভাবে যেসব কথা বর্ণনা করা হয়েছে এখন একটি ঐতিহাসিক নজীরের সাহায্যে তাকে সুস্পষ্ট করে তোলা হচ্ছে। এটি কিসের নজীর এবং ওপরের বর্ণনার সাথে এর কি সম্পর্ক তা জানার জন্যে কুরআন মজীদের অন্যান্য বর্ণনার আলোকে ৭ থেকে ১০ আয়াতে বর্ণিত দু'টি মৌলিক সত্য সম্পর্কে ভালভাবে চিন্তা গবেষণা করা উচিত।

এক ঃ সেখানে বলা হয়েছে, মানুষের নফ্সকে একটি সুগঠিত ও সুসামঞ্জস্য প্রতিকৃতির ওপর সৃষ্টি করে মহান আল্লাহ তার দুষ্কৃতি ও তাকওয়া তার প্রতি ইলহাম করেছেন। কুরআন এ সত্যটি বর্ণনা করার পর একথাও পরিষ্কার করে দিয়েছে যে, দুষ্কৃতি ও তাকওয়ার এই ইলহামী (চেতনালব্ধ) জ্ঞান প্রত্যেক ব্যক্তির নিজস্বভাবে বিস্তারিত পথ

নির্দেশনা লাভের জন্যে যথেষ্ট নয়। বরং এই উদ্দেশ্যে মহান আল্লাহ অহীর মাধ্যমে নবীগণকে বিস্তারিত পথনির্দেশনা দান করেছেন। তাতে দুষ্কৃতির আওতায় কি কি জিনিস পড়ে, যা থেকে দূরে থাকতে হবে এবং তাকওয়া কাকে বলে, তা কিভাবে হাসিল করা যায়—এসব কথা পরিষ্কারভাবে বলে দেয়া হয়েছে। যদি অহীর মাধ্যমে প্রেরিত এই বিস্ত্যরিত পথনির্দেশনা মানুষ গ্রহণ না করে, তাহলে সে দুষ্কৃতি থেকে নিজেকে বাঁচাতে পারবে না এবং তাকওয়া অবলম্বনের পথও পাবে না।

দুই ঃ এই আয়াতগুলোতে বলা হয়েছে, দুষ্কৃতি ও তাকওয়া দু'টোর মধ্যে থেকে যে কোনটি অবলম্বন করার অনিবার্য ফল হচ্ছে পুরস্কার ও শাস্তি। নফ্সকে দুষ্কৃতি মুক্ত ও তাকওয়ার সাহায্যে উন্নত করার ফলে সাফল্য অর্জিত হয়। আর তার সৎপ্রবণতাগুলোকে দাবিয়ে দিয়ে তাকে দুষ্কৃতির মধ্যে ডুবিয়ে দেবার ফল হচ্ছে ব্যর্থতা ও ধ্বংস।

একথাটি বুঝাবার জন্যে একটি ঐতিহাসিক নজীর পেশ করা হচ্ছে। এ জন্যে নমুনা হিসেবে সামূদ জাতিকে পেশ করা হয়েছে। কারণ অতীতে ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতিদের মধ্যে এই জাতিটির এলাকা ছিল মক্কাবাসীদের সবচেয়ে কাছে। উত্তর হিজাযে এর ঐতিহাসিক ধ্বংসাবশেষ ছিল। মক্কাবাসীদের বাণিজ্যিক কাফেলা সিরিয়া যাবার পথে প্রায়ই এই স্থানটি অতিক্রম করতো। জাহেলী যুগের কবিতায় এই জাতির উল্লেখ যেমন ব্যাপকভাবে করা হয়েছে তাতে বুঝা যায়, আরববাসীদের মধ্যে তাদের ধ্বংসের চর্চা অত্যন্ত ব্যাপক ছিল।

৮. অর্থাৎ তারা হযরত সালেহ আলাইহিস সালামের নবুওয়াতকে মিথ্যা গণ্য করলো। তাদেরকে হেদায়াত করার জন্যে হযরত সালেহকে পাঠানো হয়েছিল। যে দুষ্কৃতিতে তারা লিপ্ত হয়েছিল। তা ত্যাগ করতে তারা প্রস্তুত ছিল না এবং হযরত সালেহ (আ) যে তাকওয়ার দিকে তাদেরকে দাওয়াত দিচ্ছিলেন তা গ্রহণ করতে তারা চাইছিল না। নিজেদের এই বিদ্রোহী মনোভাব ও কার্যক্রমের কারণে তাই তারা তার নবুওয়াতকে মিথ্যা বলছিল। এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য পড়ুন তাফহীমুল কুরআন, সূরা আল আরাফ ৭৩–৭৬ আয়াত, হুদ ৬১–৬২ আয়াত, আশ শু'আরা ১৪১–১৫৩ আয়াত, আন নাম্ল ৪৫–৪৯ আয়াত, আল ক্বামার ২৩–২৫ আয়াত।

৯. কুরআন মজীদের অন্যান্য স্থানে এর বিস্তারিত বিবরণ দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, সামূদ জাতির লোকেরা হযরত সালেহ আলাইহিস সালামকে এই বলে চ্যালেঞ্জ দিয়েছিল, যদি তুমি সত্যবাদী হও তাহলে কোন নিশানী (মুজিযা) পেশ করো। একথায় হযরত সালেহ (আ) মুজিযা হিসেবে একটি উটনী তাদের সামনে হাযির করেন, তিনি বলেন ঃ এটি আল্লাহর উটনী। যমীনের যেখানে ইচ্ছা সে চরে বেড়াবে। একদিন সে একা সমস্ত পানি পান করবে এবং অন্যদিন তোমরা সবাই ও তোমাদের পশুরা পানি পান করবে। যদি তোমরা তার গায়ে হাত লাগাও তাহলে মনে রেখো তোমাদের ওপর কঠিন আযাব বর্ষিত হবে। একথায় তারা কিছুদিন পর্যন্ত ভয় করতে থাকলো। তারপর তারা তাদের সবচেয়ে বড় শয়তান ও বিদ্রোহী সরদারকে ডেকে বললো, এই উটনীটিকে শেষ করে দাও। সে এই কাজের দায়িত্ব নিয়ে এগিয়ে এলো। (আল আরাফ ৭৩ আয়াত, আশ্ শু'আরা ১৫৪–১৫৬ আয়াত এবং আল ক্বামার ২৯ আয়াত)

১০. সূরা আরাফে বলা হয়েছে ঃ উটনীকে হত্যা করার পর সামূদের লোকেরা সালেহ আলাইহিস সালামকে বললো, তুমি আমাদের যে আযাবের ভয় দেখাতে এখন সেই আযাব আনো। (৭৭ আয়াত) সূরা হূদে বলা হয়েছে, হযরত সালেহ (আ) তাদেরকে বললেন, তিনদিন পর্যন্ত নিজেদের গৃহে আরো আয়েশ করে নাও, তারপর আযাব এসে যাবে এবং এটি এমন একটি সতর্কবাণী যা মিথ্যা প্রমাণিত হবে না। (৬৫ আয়াত)

১১. অর্থাৎ দুনিয়ার বাদশাহ ও শাসকদের মতো নন। তিনি কোন জাতির বিরুদ্ধে পদক্ষেপ গ্রহণ করার সময় এর পরিণাম কি হবে, একথা ভাবতে বাধ্য হন না। তিনি সবার ওপর কর্তৃত্বশালী। সামূদ জাতির সাহায্যকারী এমন কোন শক্তি আছে যে তার প্রতিশোধ নিতে এগিয়ে আসবে, এ ভয় তাঁর নেই।